গ্রামে কোনও ঝামেলা নেই। রাজনৈতিক দলাদলির প্রশ্ন ওঠেনি এখন পর্যন্ত। রাজনীতির নোংরামি গঙ্গা পেরোতে গিয়ে ধুয়ে ভেসে যায় বোধহয়। দ্বীপচরের ডাঙা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। ভোটটোটের আগে ক'টাদিনের জন্য শুধু বাজার গরম হয়ে ওঠে, ব্যস! ভোটের বাজনা থিতোলেই সব ঠান্ডা।

আসলে মানুষকে পেটের ধান্দায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হলে পার্টিবাজি নামক শৌখিনতার সময় তাদের জোটে না। দ্বীপচরের অধিবাসীদের অবস্থা তেমনই। ভোটের আগে নদী পেরিয়ে নেতারা এলেন হয়তো, কিন্তু গ্রামের লোকজনকে পার্টির হুজুগে মাতিয়ে দু'তিন দলে ভাগ করতে পারেন না কখনওই। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর ভোটের সময় বুথে গিয়ে বোতাম টিপবার ব্যাপারে দ্বীপচরে সকলে এককাট্টা। আগে সকলে গুছিয়ে দক্ষিণপন্থী পুরনো দলকে ভোট দিত। তারপর কয়েকবার দিল বামপন্থীদের। তারপর বামদের হঠিয়ে ক্ষমতায় এল নতুন দল। গতবার পঞ্চায়েতে দিয়েছে সেই দলকেই। শুধু গ্রামের নির্দল প্রার্থী টগরের বাবা বেচু মণ্ডলকে চেনা মানুষ বলে জিতিয়ে দিয়েছে। সকলের কাছে গ্রামবাসীর দাবি একটাই। গ্রাম থেকে নদীর ওপারে হাইরোড পর্যন্ত একটা ব্রিজ করে দিতে হবে। নিয়মমাফিক ভোটের ধান্দায় সব দলই প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছে। তারপর ভোটে হেরে কিংবা জিতে সব দলই বাধ্য হয়ে বিলোনো স্তোকবাক্য ভুলে গিয়েছে যথারীতি। কোনও দল বা নেতা কথা রাখেনি।

তাই এবার লোকসভার ভোটে গোটা গ্রামের মানুষ একজোট হয়ে কাউকে ভোট দিল না। পেপারে-টিভিতে খবর ছড়াল। ভোটবাবুরা বুথে এসে পিকনিক করে ফিরে গেলেন। বেজায় আহ্লাদ তাঁদের। চটপট পাট গুটিয়ে পালাতে পেরেছেন। পোলিং মেটেরিয়াল কালেকশন সেন্টারে রাত জেগে লাইন লাগাতে হয়নি। খবর জানার পর কাগুজে বাঘেরা বিস্তর তম্বি করলেন। এত বড় দুঃসাহস। উত্তরগ্রাম আর দক্ষিণগ্রাম (আসলে দ্বীপচরের মাঝামাঝি একটা খালের এপার-ওপার দুটো পাড়া) দু'টো বুথেই সমবেত প্রতিবাদ। সম্পূর্ণ ভোট বয়কট। হুমকি দেওয়া হয়েছিল আগে থেকেই। কারও টনক নড়েনি। আজও দ্বীপটি মূল স্থলভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন। ফেরি নৌকায় বাইরের জগতে যাতায়াত। খালের উপর একটা বাঁশের সাঁকো বানিয়ে নিয়েছে নিজেরাই। গঙ্গার উপর তো সেটা সম্ভব নয়।

বিচ্ছিন্ন শুধু ভৌগোলিক দিক থেকেই নয়। সামাজিকভাবেও বাইরের পৃথিবী থেকে দ্বীপচর ছিল সংযোগহীন। বেশিরভাগ বৈবাহিক সম্পর্ক গ্রামের দু'টো পরিবারের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। ইদানীং পূর্বপাড়ের অনুন্নত গ্রামগুলো থেকে ছেলেমেয়েরা পড়তে আসছে হাইস্কুলটা অনুমোদন পাওয়ার পর। ব্যবসায়িক কারণে এবং আনুষঙ্গিক ধান্দায় বাইরের ব্যাপারিদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। এলাকার চরিত্র বদলে যাচ্ছে দ্রুত।

এখানকার খেতের পলি-পড়া বেলে দোঁয়াশ মাটি খুব উর্বর। পটল বেগুন উচ্ছে মূলো তো হয়ই, নতুন চাষ শুরু হয়েছে তুঁতেরও। জিয়াগঞ্জ থেকে এক টাকমাথা হলুদ টিপ-পরা মাড়োয়ারি বছর খানেক হল দ্বীপচরে যাতায়াত করছেন। মানমল সেরাওগি। গ্রামের এক উঠতি মস্তান ভাটুকে টাকার টোপে সাগরেদ বানিয়েছেন তিনি। মোরামের রাস্তার উপর ছিমছাম ছোট একখানা বাড়িও তৈরি করালেন। দরকার পড়লে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা। ভাটু ছাড়াও মানিক আর চিত্ত নামে দুই তরুণকে বহাল করেছেন সব সময়ের কর্মী হিসেবে।

মানমল বিঘেচারেক জমি কিনে তুঁত চাষ করছেন। রেশম পাওয়া যায় পলুপোকার গুটি থেকে। সেই পোকার প্রধান খাদ্য তুঁতপাতা। মানিক আর চিত্ত পলুপোকার জন্য তুঁতচাষের তদ্বির করে। ব্যবসাটা জঙ্গিপুর মহকুমায় একচেটিয়া। আর কেউ এমন ঝুঁকি নিতে পারেনি। মানমলবাবু নিজের শহরে রিলিং মেশিন বসিয়েছেন। মুর্শিদাবাদ জেলা সিল্কের পীঠস্থান। রেশমি সুতোর দারুণ চাহিদা।

এই মাড়োয়ারি বাবুটি মানুষ মন্দ নন। বড্ড মিষ্টভাষী। মুখখানায় চিলতে হাসি সবসময় লেগে আছে। কোটিপতি ব্যবসায়ী, নানারকম ব্যবসা থেকে বিস্তর কামাচ্ছেন, অথচ বিন্দুমাত্র অহমিকা নেই। স্কুলে এসে সদানন্দর সঙ্গে আলাপ করে গিয়েছেন একদিন নিজে থেকেই, তারপর রাস্তাঘাটে দু'জনের দেখাসাক্ষাৎ কুশল বিনিময় হয় মুখোমুখি হলে। মানমল তাঁর 'মহাবীর ভিলা'য় যাওয়ার জন্য বলেন। সদানন্দ এখনও সময় করে উঠতে পারেনি।

প্রথম পরিচয়ের দিন বাবুটি বলেছিলেন, আপনারা পণ্ডিত মানুষ। সঙ্গ পেলে মনটা ভালো হয়। আমরা তো ধান্দাপাতি নিয়েই ব্যস্ত। সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করতে পারলাম না। আপশোস হয়। যদি আপনাদের কোনও দরকারে লাগতে পারি, বহোৎ খুশি হব।

সদানন্দ সহজ সরল মানুষ। সাদাসিধে। কিন্তু বোকাসোকা নয় মোটেই। সে ভালোই বোঝে, এ'সব ধুরন্ধর ব্যবসায়ীর কথার কথা। তাঁর নানারকম সাদাকালো কারবারে যদি কখনও গ্রামের মানুষের সাহায্য দরকার হয়, তাই সদানন্দকে হাতে রাখতে চান। ভদ্রলোক ভাল করেই জানেন, সদানন্দকে ধনীনির্ধন শিক্ষিত-অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধা করে এবং ভালোওবাসে। দু'বছর পরে বিধানসভার ভোট। কিছু ছাত্রযুবক এলাকার উন্নতির জন্য সদানন্দকে এম.এল.এ করার দাবি তুলেছে তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও। মানমলবাবু খবরটা পেয়ে গিয়েছেন। মাস্টারমশাই যদি তালগোলে নেতাফেতা বনে যান , তাই আগে থেকেই হাতে রাখার চেষ্টা।

সদানন্দ অবশ্য অত সহজে গলবার পাত্র নয়। মানমলের সাদা ব্যবসা সে চোখে দেখতে পায়। সিল্ক প্রোডাকশন ইউনিট। কিন্তু কালো কারবারেরও খবর কখনও কানে আসে। যদিও প্রমাণ কিছু পায়নি। তবুও বেণুর দোকানে ভাটুর কিছু চ্যালাচামুন্ডা সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করে যে সব আলোচনা চালায়, তাতে সদানন্দর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন অনুভব করে ভদ্রলোকের পদ্মা পেরিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে কোনও অবৈধ কারবার আছে। ভাটুরা হচ্ছে সেই সন্দেহজনক ব্যবসার মাধ্যম।

(ক্রমশ)

অঙ্কন ঃ সোমনাথ

কোটিপতি ব্যবসায়ী, নানারকম ব্যবসা থেকে বিস্তর কামাচ্ছেন, অথচ বিন্দুমাত্র অহমিকা নেই। স্কুলে এসে সদানন্দর সঙ্গে আলাপ করে গিয়েছেন একদিন নিজে থেকেই, তারপর রাস্তাঘাটে দু'জনের দেখাসাক্ষাৎ কুশল বিনিময় হয় মুখোমুখি হলে। মানমল তাঁর 'মহাবীর ভিলা'য় যাওয়ার জন্য বলেন। সদানন্দ এখনও সময় করে উঠতে পারেনি

রসেবশে

কোথা যাও নাচি নাচি

তনুশ্রী পাল

বছর পনেরো আগে পড়াতাম এক কো-এড স্কুলে। বিদ্যালয় ও তার বাইরের সামাজিক পরিবেশও তখন ছিল আলাদা রকমের। এমনিতেই অরণ্যের গা ঘেঁষা ছোট্ট শহরতলি। তায় 'নেট্'-এর জাল বিস্তারিত হয়ে পুঁটি, মৃগেল সবাইকে গ্রাস করেছে এমনটাও নয়। স্কুলের দুষ্টুমি ও তার শাস্তি সবই সাধারণ ও পরিচিত। বেঞ্চের ওপর কান ধরে দাঁড়ানো, ক্লাসের বাইরে এক ঠ্যাঙে বক, নিলডাউন হয়ে থাকা ইত্যাদি শাস্তির প্রচলন ছিল। বারান্দা দিয়ে অন্য শিক্ষকেরা বা ছাত্ররা যাওয়ার সময় এ দৃশ্য দেখত, শাস্তিপ্রাপ্তরা লজ্জা পেত!

শাস্তি প্রদানে সব শিক্ষকেরা সমান উৎসাহী ছিলেন এমনটাও নয়! অঙ্কে গোল্লা, ইংরেজিতে দুই, বাংলায় সাত এমনসব নম্বরে স্থিতপ্রজ্ঞ ছাত্রদের খাতা ছুড়ে ফেলা, ডাস্টার ছুড়ে ফেলা, কানমলা, পশ্চাদ্দেশে দু-চারটি স্কেলের বাড়ির নিদান দিতেন কেউ কেউ। খরোষ্ঠী বা ব্রাহ্মীলিপিতে রচিত উত্তরপত্রের সামনে বসে হতাশায় ভুগতাম অনেকেই। 'মেরে হাড়গুঁড়ো করব', 'কান টেনে লম্বা করে দেব', 'একটা অঙ্ক চল্লিশবার করতে হবে, না হলে ছুটি নাই' ইত্যাদি আস্ফালন ও হুংকারে ছাত্রদের ব্যস্ত রাখার একটা আবহাওয়া ছিলই। তাতে ছাত্রদের খুব ক্ষতি হয়েছে এমনটা নয়। অভিভাবক-সহ নানা মহল ছাত্রের প্রতি অত্যাচার বন্ধে ছুটে এসেছেন এমনটাও সে সময় ঘটেনি।

আবার শাস্তিযোগ্য বিষয়গুলির মধ্যে ছিল, পড়ায় অমনোযোগ, ক্লাসে দুষ্টুমি, ক্লাসে বা স্কুলমাঠে মারামারি, প্রেয়ারে না এসে ক্লাসে লুকিয়ে থাকা, নকল করা, দেওয়াল টপকে বা অন্য উপায়ে স্কুল পালানো, অন্যের ব্যাগ থেকে চুরি ইত্যাদি। এ সব ক্ষেত্রে বকা-ঝকা, গার্জিয়ান কল সবই হত। তা সে সময় স্কুলের ইতিহাসে নতুন ঘটনার সংযোজন হল। আজকের সময়ের প্রেক্ষিতে সামান্য ঘটনা বলতে পারেন কেউ কেউ, কিন্তু আমরা কো-এড স্কুল বলেই বেশি সতর্ক ছিলাম।

প্রমাণ-সহ অভিযোগ জমা পড়ল ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নিখিল স্যারের দরবারে। সদ্য সেভেন বালিকা, সদ্য নবম কিশোরকে প্রতিদিন পত্র দিচ্ছে, টিফিনের সময় বাইরে একসঙ্গে ফুচকা খাচ্ছে। স্কুল ড্রেসেই, স্কুলে না এসে সপ্তম নাকি নবমের সাইকেলে চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বালিকার (ঈর্ষান্বিত) বন্ধুরাই খবর ফাঁস করে দেয়। যাইহোক নিখিল স্যার আমায় নির্দেশ দিলেন বালিকার ব্যাগ তল্লাশির। মেয়েদের ব্যাগ স্যারেরা ধরবেন না। জনা দুয়েক শিক্ষিকা-সহ বালিকার স্কুলব্যাগের অন্দরের সম্পত্তি হাটকানো চলল। সামনের পকেটেই মিলল গুপ্তধন। কালপ্রিট কখনও ভ্রু কুঁচকে, কখনও চোখ গোল্লা করে দিদিমণিদের কীর্তি অবলোকন করতে থাকে। গুপ্তধনের সংখ্যা পাঁচ। সেগুলি আদতে প্রেমপত্র। তিনটি নায়িকার, দুটি নায়ক রচিত। প্রচুর হিন্দি ও বাংলাগানের কলি, ফুল, পাখি, গাছ, পাহাড়, মায় একটা এরোপ্লেনও এঁকেছে সেই সুপুত্র। বালিকা বৃষ্টি মেঘ এঁকে লিখেছে, 'টিপ টিপ বরষা পানি, পানি মে আগ লাগায়ে' ইত্যাদি। অশুদ্ধ বানান ও ব্যাঁকাত্যাড়া অক্ষরমালায় সজ্জিত পত্রাবলি। অতিকষ্টে হাসি চেপে, ভয়ঙ্কর রাগী চোখে বালিকার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করি। এ সকল ঘটনার মধ্যেই সেই সদ্য নবম দেওয়াল টপকে পলায়ন করেছে, খবর এল। সহপাঠীরা সকলে মিলে ধাওয়া করেও সেই ছুটন্ত হরিণটিকে ধরতে পারে না। এই সংবাদে সে বালিকা কি শিক্ষা গ্রহণ করল সেই জানে! বালিকার গার্জিয়ান কল, নানাবিধ উপদেশাবলী প্রদানের পর বিষয়টির সাময়িক ফয়সালা হল। পরে জেনেছিলাম, চাকরিতে জয়েন করে নিখিল স্যার তাঁর এক ছাত্রীর সঙ্গেই 'ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা'য় দুলে দুলে প্রজাপতির নিবন্ধ স্বীকার করেন! সে প্রেম নাকি স্যারের প্রথম যৌবনের।

মাঝে অনেকগুলো বছর গেল, যুগ ও সময় পাল্টে গেল দ্রুত। এক বালিকা বিদ্যালয়ে এলাম এবার। শহর থেকে মাইল দশেক দূরে, প্রান্তিক এক গ্রাম। অর্থনীতি ও শিক্ষায় খানিক পিছিয়েই। তবে ইতিমধ্যেই গ্রামেগঞ্জেও অন্তর্জাল বাহিত জ্ঞান আবার টিভি সিরিয়াল বাহিত নবতর আশ্চর্য সংস্কৃতি অনেক মানুষের রুচি, পোশাক মায় নীতিবোধও নিয়ন্ত্রণ করছে, এ ঘটনা সত্য। সাইকেল, মিড ডে মিল, আরও নানা প্রকল্পের কল্যাণে বালিকা বিবাহ খানিক রুখে দেওয়া গিয়েছে। কিন্তু প্রেম? দুর্বার গতিতে অগ্রসর হয়ে সে যে নেহাৎ ওই ষষ্ঠ-সপ্তমের নিতান্ত বালিকাকেও ভাসিয়ে নিতে চায়। নানা উপদেশ শুনিয়ে, ভাল কেরিয়ার ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন চোখে এঁকে দিয়েও তেমন উপকার যেন হচ্ছে না! যাই হোক এবার ষষ্ঠশ্রেণির দুই রোগা পটকাই কালপ্রিট। অভিযোগ, লাস্টবেঞ্চে বসে রোজ তারা হাসে ও গল্প করে। ইতিহাসের মমতাদির ক্লাসে বমাল ধরা পড়ে তারা। ক্লাসের অন্য মেয়েরাও এদের নামে নানা অভিযোগ করে। অঙ্ক খাতার শ্বেতশুভ্র দুই পৃষ্ঠাব্যপী রেখা ও অক্ষরের কত যে নিদর্শন। সে চিঠি বড়দিমণির হাত ঘুরে স্টাফরুমে এল। দিদিমণিরা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত হন। লাল কালি ব্যবহারকারিনী চিত্র এঁকেছে নানাবিধ। উপর থেকে নীচে মোট তিনটি তিরবিদ্ধ হৃদপিণ্ডের ছবি। প্রথম ছবির পাশে ইংরেজিতে লেখা '১০০% লাভ'। মনের মাঝে তুমি 'জীবন সাথী তুমি', 'আমি তোমাকে ভালবাসি', 'আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না' - ইত্যাদি বাংলায় লেখা। একদম নীচে ডানধারে লেখা - 'এটি হল প্রেমের কথা', বাঁ ধারে লেখা 'প্রেম করো আর বিয়ে করো'।

নীল কালির লেখিকা পৃষ্ঠার ডান ধারে একদম উপরে একটি পোকার ছবি এঁকে তির চিহ্ন দিয়ে পাশে লিখেছে প্রজাপতি। চারটি করে পঙক্তিতে সজ্জিত মোট এগারোটি ছড়া সে সাজিয়েছে। যেমন, 'জলে তো নেমেছি/সাঁতার তো কাটবই/প্রেম তো করেছি/বিয়ে তো করবই'।

'পি তে প্রজাপতি/টিতে তারা/দেব কি থাকতে পারে/কোয়েল ছাড়া'

'দেবের মতো দেখতে তুমি/জিৎ-এর মতো হাসি/সত্যি করে বলছি আমি/তোমায় ভালোবাসি।'

'শীতে কি ধান হয়/বর্ষা না এলে/দূরে কী প্রেম হয়/কাছে না এলে'

'আম মিষ্টি জাম মিষ্টি/তেঁতুল বড় টক/তোমার হাতে সিঁদুর পরার/আমার বড় শখ।'

'ঝিরিঝিরি বাদামগুলি/খেতে ভারি মিষ্টি/তোমার আমার বন্ধুত্ব/কী করে হল সৃষ্টি'।

এইরকম সব ছড়া। আমি বলি, সম্ভবত নানা জায়গা থেকে সংকলন করা হয়েছে বা নিজেরাই ছড়া লিখে গুছিয়ে রাখছে, ভবিষ্যতের আশায়। ছড়-টড়া পড়ে হাসতে গিয়েও আমরা তেমন হাসতে পারি না। এমন প্রেমের জোয়ারে ভেসে এ বয়সেই ঘর দেশ ছেড়ে রওনা হলে কোন সে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে, ওরা বোঝে? কল্পনা করতে পারে? এরমধ্যেই বাংলার মিস হঠাৎ গদগদ হয়ে বলেন, 'দ্যাখো দ্যাখো কেমন ছন্দ জ্ঞান হয়েছে ওদের আর বানান ভুলও কম। পেন দিয়ে ভুল বানানে গোল্লা আঁকেন উনি। বড়দিমণি ধমক দেন, 'থামুন তো, খুব করে কাউন্সেলিং করাতে হবে বুঝেছেন। মিষ্টি, তেতো, টক, ঝাল সবরকম ভাষাতেই বোঝাতে হবে প্রতিদিন। বলুন এদের, চোখ, লিভার, রক্ত, কিডনি সবই বিক্রি হয়। বুঝেছেন আপনারা? বুঝি আমরা, কিন্তু এই সিঁদুর পরার এখনই যাদের এত শখ বোঝাতে চাইলে বুঝবে তো তারা? কেন জানি - 'দেব কি থাকতে পারে/কোয়েল ছাড়া' লাইনটি উচ্চারণ করেন অঙ্ক দিদিমণি, মিষ্টি করে হেসে হেসে! বড়দিমণি সেদিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার বলেন, 'ওদের বোঝান, নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেবে, পরিণতি ভয়ংকর।'

অঙ্কন ঃ অভি